

দু'হাজার তেরোর দশ জানুয়ারি ছাত্রশ্রমী হাজার এক শ' তিরানবাইট বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ধাপে ধাপে তা কার্যকরও হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রে খুব বেশি পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি।

একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন জানায়, প্রাথমিক স্তরে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শিক্ষার্থী ভালভাবে শিখছে না। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বেশিরভাগ শিক্ষার্থী বাংলাই ভালভাবে পড়তে পারে না, গণিত ও ইংরেজীর অবস্থা আরও খারাপ। পঞ্চম শ্রেণীর শতকরা মাত্র পঁচিশ ভাগ শিশু বাংলায় এবং তেত্রিশ ভাগ গণিতে আশানুরূপ দক্ষতা অর্জন করতে পারছে। এর পরও এসব শিশু উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হচ্ছে। প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থীর শেখার মাত্রা খারাপ তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই ঝরে পড়ার ঝুঁকি বেশি। ঝরে পড়ার পর এক পর্যায়ে তারা আনুষ্ঠানিক কর্মবাজারে প্রবেশ করে।

ঝরে পড়া বা ড্রপআউট নিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান গবেষণা ইত্যাদি হয়েছে। সে সবের জন্য বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকাও

মিনু শামস

এসেছে। কিন্তু এত অর্থব্যয়ের পরও ঝরে পড়া বন্ধ হয়নি। তার কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তাদের বেশিরভাগের জীবন আবর্তিত হয় প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায়। ঝরে পড়া এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা একে অন্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এদের জীবনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার স্থায়ী সমাধানের কথা দেশী বিদেশী কোন গবেষকই বলেন না। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর না করে ঝরে পড়া নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই।

শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কী করে শিখছে এবং সামগ্রিকভাবে কতটুকু বুঝতে পারছে, তা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। তারা বাধা ধরা পদ্ধতিতে পড়ান। পড়ানোর বিষয়ে তাদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শেখার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। সেখানে দুর্বলতা থাকলে উচ্চ শিক্ষায় যত চাকচিক্য থাক শিক্ষা ব্যবস্থাটা ঠিক মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। তিয়ান্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অতগুলো প্রতিষ্ঠান এক সঙ্গে সরকারী করা সম্ভব নয় বলে তখনও ধাপে ধাপে করার জন্য কয়েক বছর সময় নেয়া হয়েছিল। সে সঙ্গে প্রথম পাঁচসালী পরিকল্পনায় পাঁচ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। উনিশ শ' চুয়াত্তর সালে কুদরই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বাড়িয়ে আট বছর করা এবং উনিশ শ' তিরানবাইট সালের মধ্যে তা বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। তাদের প্রস্তাব ছিল, আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা হবে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও জাতীয় শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলেছে, এটা করতে হলে সরকারী-বেসরকারীসহ প্রায় আশি হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ এবং অবকাঠামো সুবিধা বাড়াতে হবে। দেশের দুই হাজার দুই শ'টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল চরম দুরবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। এ সংক্রান্ত/যেসব প্রস্তাব এসেছে তা বাস্তবায়ন করতে যে টাকা ও অবকাঠামো সুবিধা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করতেই ছয়-সাত বছর লাগবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও তারা বলেছে। কারণ ব্যবস্থাটা তখন দুই মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। তারপরও বেশ কিছু সময় পার হওয়ার পর গত বছর এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা জটিলতায় তা সফল হয়নি।

সেই প্রথম পাঁচসালী পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তারপর

প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়ল কী?



প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা পড়ে তাদের বেশিরভাগের জীবন আবর্তিত হয় প্রচণ্ড অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায়।

ঝরে পড়া এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা একে অন্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এদের জীবনের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার স্থায়ী সমাধানের কথা দেশী বিদেশী কোন গবেষকই বলেন না। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর না করে ঝরে পড়া নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই। শিক্ষার্থীরা কী শিখছে, কী করে শিখছে এবং সামগ্রিকভাবে কতটুকু বুঝতে পারছে, তা প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদেরও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। তারা বাধা ধরা পদ্ধতিতে পড়ান। পড়ানোর বিষয়ে তাদের জ্ঞানের অপ্রতুলতা শিক্ষার্থীদের শেখার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে

এত বছরে এই প্রথম একসঙ্গে এতগুলো বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে। এতে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ তিন হাজার আটশ পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষকের চাকরিও সরকারী হয়েছে। দু'দশকের বেশি সময় ধরে এই শিক্ষকরা আন্দোলন করছিলেন। তবে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হলেও পরিবর্তন হয়নি শিক্ষার মানের। শিক্ষকদের গুণগত মানের প্রশ্নও আছে, প্রশ্ন আছে শিক্ষার্থীদের মান নিয়েও। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মূলত কারা? অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা এদের মধ্যে কেউ কেউ মাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেও বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চতর স্তরে পৌঁছানো এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত পৌঁছানো তো সুদূরপ্রসারী ঘটনা, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছতেই ঝরে যায় অনেকে। সামান্য সচ্ছল অভিভাবকও সন্তান নিয়ে কিন্ডারগার্টেন বা ওই মারের অন্য স্কুলে ছোটেন। তারা সন্তানের

প্রতিদিনের পড়াশোনা তদারকির বিষয়ে প্রথর সচেতন। শিক্ষকদের যে কোন গাফিলতিতে তারা বিদ্যালয়ে গিয়ে জবাবদিহি করেন। শিক্ষকরাও স্বাভাবিকভাবে পাঠদান বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি সচেতন। সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার শিখর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েই অভিভাবকরা তার শিক্ষার ভেতের প্রতি মনোযোগী হন। কিন্তু অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত যে অভিভাবক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজের সন্তানকে পাঠান তার সচেতনতা ওই পাঠানো পর্যন্তই। তিনি জানেন না, সন্তান স্কুলে কি পড়ছে। ভুল শিখছে কিনা। শিক্ষককে ভুলের জন্য অভিভাবকের কাঁঠগড়ায় দাঁড় করানোর মতো বিদ্যা বা অর্থের জোর তার নেই। মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা যেসব বিদ্যালয়ে পড়ে সেখানকার শিক্ষকরা অভিভাবকদের চাপে, চৌকস শিক্ষার্থী পাওয়ার আনন্দে বা নিজের আর্থিক জীবনের স্থিতিশীলতার জন্য নিজের পেশার বিষয়ে প্রয়োজনের

চেয়ে বেশি সিরিয়াস। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সামনে এর একটিরও উপস্থিতি নেই। নিজের গুরুত্বপূর্ণ পেশাটি তাই নিজের কাছেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। গ্রামাঞ্চলের বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বেলায় এ কথা আরও বেশি সত্য। রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সচল রাখতে হলে এ বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগী হতে হবে। সাধারণ শিক্ষিত স্বল্প বিত্ত মানুষ ও এখন শহরমুখী। আধুনিক জীবনযাপনের ছোঁয়া বিশেষ করে সন্তানের সুশিক্ষার জন্য তারা উর্ধ্বাঙ্গে ছুটছেন শহরে। প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হয়েছে। একে আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই এ থেকে সুফল পাওয়া যাবে। বিদ্যালয়ের মান বাড়ানোর পাশাপাশি এখানে যারা পড়ছে তাদের জীবনযাপনের মানও বাড়াতে হবে। নইলে প্রাথমিক বিদ্যালয় নিস্তরঙ্গই থেকে যাবে।